بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৮ মে, ২০২০ মোতাবেক ০৮ হিজরত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি একজন বদরী সাহাবী হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করব। হযরত খাব্বাব এর সম্পর্ক ছিল বনু সাদ বিন যায়েদ গোত্রের সাথে। তার পিতার নাম ছিল আরত বিন জানদালা। তার উপনাম আবু আব্দুল্লাহ্, আবার কারো কারো মতে আবু মুহাম্মদ আর আবু ইয়াহিয়াও ছিল। অজ্ঞতার যুগে কৃতদাস বানিয়ে তাকে মক্কায় বিক্রি করে দেয়া হয়। তিনি উতবা বিন গাযওয়ানের কৃতদাস ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি উম্মে আনমার খুযাইয়ার কৃতদাস ছিলেন। তিনি বনু যোহরা-এর মিত্র হন। সর্বপ্রথম যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের মাঝে তিনি ছিলেন ষষ্ঠ আর তিনি সেসব প্রাথমিক সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করার ফলশ্রুতিতে চরম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন। হযরত খাব্বাব রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দ্বারে আরকামে গমন এবং সেখান থেকে তবলীগ আরম্ভ করার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুজাহেদ বলেন, সর্বপ্রথম যারা মহানবী (সা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন তারা হলেন-

হযরত আবু বকর, হযরত খাব্বাব, হযরত সুহায়েব, হযরত বেলাল, হযরত আম্মার এবং হযরত আম্মারের মাতা হযরত সুমাইয়া। যাহোক, মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর চাচা আবু তালিব-এর মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখেন আর হযরত আবু বকর (রা.)-কে স্বয়ং তার জাতি নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছিল। এখানে এই লেখক এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি লিখেছেন যে, তাঁর (সা.) চাচা আবু তালিব তাকে সুরক্ষিত রাখেন বা তার কারণে তিনি নিরাপদ ছিলেন- এ সত্ত্বেও, আবশ্যকীয় বিষয় যা হয়ত লেখকের মাথায় ছিল না তাহলো, মহানবী (সা.) নিজেও মক্কার মুশরিকদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ ছিলেন না আর হযরত আবু বকরও নিরাপদ ছিলেন না। ইতিহাস এর সাক্ষী যে, তাদেরকেও বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার-নিপীড়নের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়েছে বরং হযরত আবু তালিবকেও অত্যাচারের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয়েছে। এরপর এই লেখক লিখেন যে, তারা উভয়ে নিরাপদ থাকলেও বাকি সবাইকে লোহার বর্ম পরানো হয় এবং তাদেরকে সূর্যের প্রখর রোদে ঝলসানো হয়। আর যতটা আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন, তারা লোহা এবং সূর্যের তাপ সহ্য করেছেন। শা'বী বলেন, হযরত খাব্বাব (রা.) অনেক ধৈর্য ধারণ করেছেন আর কাফেরদের দাবি-দাওয়া অর্থাৎ ইসলামকে অস্বীকার করা মেনে নেন নি। এ কারণে তারা তার পিঠে তপ্ত পাথর রেখে দেয়, যার ফলে তার পিঠের মাংস বা পেশি নষ্ট হয়ে যায়। এই পুরো রেওয়ায়েত উসদুল গাবা গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

হযরত খাব্বাবের একটি ঘটনা যা হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সময় ঘটেছিল– এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে এভাবে বর্ণনা করেন যে,

হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের মাত্র কয়েক দিন অতিবাহিত হতেই, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের আরো একটি আনন্দঘন মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন। অর্থাৎ হযরত উমর, যিনি তখনও ঘোর বিরোধী ছিলেন, মুসলমান হয়ে যান। তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও খুবই আকর্ষণীয়। অনেকেই এটি শুনেছেন এবং পড়েছেন, কিন্তু তিনি যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তা-ও বর্ণনা করে দিচ্ছি আর ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এটি বর্ণনা করা আবশ্যক। হযরত উমর (রা.)'র স্বভাবে রাগ বা কঠোরতার উপকরণ এমনিতেই বেশি ছিল কিন্তু ইসলামের শত্রুতা এটিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। যেমন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উমর (রা.) দরিদ্র ও দুর্বল মুসলমানদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে চরম কষ্ট দিতেন, কিন্তু তিনি যখন তাদেরকে নির্যাতন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং যখন দেখলেন যে, তাদের ফিরে আসার কোন লক্ষণ নেই, তখন চিন্তা করলেন এই বিশৃঙ্খলার বা নৈরাজ্যের হোতা অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কেই শেষ করে দেই না কেন। যেমন চিন্তা তেমন কাজ, এই চিন্তা মাথায় আসতেই তিনি তরবারি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন আর মহানবী (সা.)-কে খুঁজতে আরম্ভ করেন। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি তাকে নগ্ন তরবারি হাতে নিয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করে, উমর! কোথায় যাচ্ছ? উমর (রা.) উত্তরে বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছি। তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করে তুমি কি বনু আবদে মানাফ এর হাত থেকে রক্ষা পাবে? প্রথমে নিজের ঘরের খবর নাও, তোমার বোন ও ভগ্নিপতি মুসলমান হয়ে গেছে। হযরত উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ দিক পরিবর্তন করে নিজের বোন ফাতেমার বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি যখন ঘরের কাছাকাছি পৌঁছেন তখন ভেতর থেকে পবিত্র কুরআন পাঠের শব্দ শুনতে পান, যা হযরত খাব্বাব বিন আল্-আরত (রা.) সুললিত কণ্ঠে পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। এই শব্দ শুনতেই উমর (রা.)-এর রাগ আরো বেড়ে যায়। তিনি ত্বরিতগতিতে ঘরে প্রবেশ করেন। কিন্তু তার পায়ের শব্দ শুনতেই হযরত খাব্বাব (রা.) কোথাও লুকিয়ে পড়েন আর ফাতেমা (রা.)-ও পবিত্র কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো এদিক-সেদিকে লুকিয়ে ফেলেন। হযরত উমর (রা.)-এর বোনের নাম ছিল ফাতেমা। হযরত উমর (রা.) ঘরের ভেতরে এসে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, আমি শুনলাম– তুমি নাকি নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছ? এ কথা বলে নিজ ভগ্নিপতি সাঈদ বিন যায়েদের ওপর হামলে পড়েন। ফাতেমা তার স্বামীকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসলে তিনিও আহত হন, কিন্তু ফাতেমা নির্ভীকচিত্তে বলেন, হ্যাঁ উমর! আমরা মুসলমান হয়ে গেছি, এখন তোমার যা ইচ্ছা করতে পারো, আমরা ইসলাম পরিত্যাগ করতে পারবো না। হযরত উমর খুবই কঠোর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন কিন্তু এই কঠোরতার অন্তরালে ভালোবাসা ও কোমলতারও একটি দিক ছিল যা কখনো কখনো স্বীয় রূপ প্রকাশ করত। বোনের এই সাহসী বাক্য শুনতেই তিনি বোনের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখেন যে, সে রক্তে রঞ্জিত। উমর (রা.)'র হৃদয়ে এই দৃশ্যের এক বিশেষ প্রভাব পড়ে। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বোনকে তিনি বলেন, তোমরা যে বাণী পড়ছিলে আমাকে একটু দেখাবে! ফাতেমা (রা.) বলেন, আমি দেখাবো না, কেননা তুমি এই পৃষ্ঠাগুলো নষ্ট করে ফেলবে বা এই পৃষ্ঠাগুলো ছিড়ে ফেলবে। উত্তরে উমর বলেন না, নষ্ট করবো না, তুমি আমাকে দেখাও, আমি অবশ্যই ফিরিয়ে দেব। ফতেমা (রা.) বলেন, তুমি অপবিত্র, কিন্তু কুরআন যে পবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করতে হয়। অতএব, প্রথমে তুমি গোসল করে নাও, তারপর দেখবে। অর্থাৎ এরপর আমি দেখাবো, তখন তুমি দেখে নিও। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, সম্ভবত এটিও তার উদ্দেশ্য ছিল যে, গোসল করলে উমরের রাগ পুরোপুরি

প্রশমিত হয়ে যাবে আর তিনি প্রশান্ত চিত্তে চিন্তা করার যোগ্যতা ফিরে পাবেন। উমর (রা.)'র গোসল শেষ হলে ফাতেমা কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো বের করে তার সামনে রেখে দেন। তিনি তা হাতে নিয়ে যে আয়াতগুলো দেখেন সেগুলো ছিল সূরা ত্বাহা'র প্রথমদিকের কয়েকটি আয়াত। হযরত উমর (রা.) ত্রস্ত-হৃদয়ে তা পাঠ করতে আরম্ভ করেন আর এর এক একটি শব্দ এই পবিত্রচেতার হৃদয়ে ঘর করে নিচ্ছিল অর্থাৎ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করছিল। পাঠ করতে করতে হযরত উমর (রা.) যখন এই আয়াতে এসে উপনীত হন যে,

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই এই বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও অধিপতি। আমি ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। অতএব, তোমাদের উচিত, শুধুমাত্র আমারই ইবাদত করা আর আমার স্মরণার্থেই নিজেদের প্রার্থনাসমূহকে উৎসর্গ করা। দেখ! সেই প্রতিশ্রুত মুহূর্ত শীঘ্র আসছে বা সন্নিকটে, কিন্তু আমরা সেই সময়কে অপ্রকাশিত রেখেছি যেন প্রত্যেকে নিজ কৃতকর্মের যথাযথ প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। (সূরা ত্বাহাঃ ১৫-১৬)

হযরত উমর (রা.) যখন এই আয়াত পাঠ করেন, তখন যেন তার চোখ খুলে যায় এবং তার ঘুমন্ত প্রকৃতি হঠাৎ জাগ্রত হয়ে যায় আর অবলীলায় বলে উঠে, এ কেমন বিস্ময়কর ও পবিত্র বাণী! হযরত খাব্বাব এই বাক্য শোনামাত্রই বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এটি নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.)-এর দোয়ার ফল। কেননা, আল্লাহ্‌র কসম! আমি গতকালই তাঁকে এই দোয়া করতে শুনেছিলাম যে, হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশাম অর্থাৎ আবু জাহলের মধ্য থেকে যেকোন একজন অবশ্যই ইসলামকে দান কর। হযরত উমর (রা.)-এর জন্য প্রতিটি মুহূর্ত তখন অহসহনীয় ছিল, অর্থাৎ এই বাণী পড়ার পর এবং মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা উপলব্ধি করার পর এখানে এক মুহূর্তের জন্য স্থির থাকা তার জন্য দুষ্কর হয়ে ওঠেছিল। তিনি হযরত খাব্বাব (রা.)-কে বলেন, আমাকে এই মুহূর্তে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে যাওয়ার পথ বলে দাও, তিনি কোথায়। কিন্তু তিনি এতটাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসেছিলেন যে, তরবারি পূর্ববৎ নগ্ন অবস্থায় উঁচিয়ে রেখেছিলেন। অর্থাৎ তরবারি খাপে ঢুকানোর কথা মাথায় আসে নি, নগ্ন তরবারি হাতে ধরে রেখেছিলেন। যাহোক, সে যুগে মহানবী (সা.) দ্বারে আরকামে অবস্থান করছিলেন, তাই হযরত খাব্বাব (রা.) তাকে সেখানকার ঠিকানা বলে দেন। হযরত উমর (রা.) সেখানে যান এবং দরজায় পৌঁছে সজোরে কড়া নাড়েন। সাহাবীগণ (রা.) দরজার ফাঁক দিয়ে হযরত উমর (রা.)-কে নগ্ন তরবারি হাতে দণ্ডায়মান দেখে দরজা খুলতে ইতস্তত করলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, দরজা খুলে দাও। তখন হযরত হামযা (রা.)ও সেখানে ছিলেন, তিনিও বলেন, দরজা খুলে দাও। যদি সদুদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে তো ভালো আর যদি মন্দ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! তার তরবারি দিয়েই তার শিরোচ্ছেদ করব বা মুণ্ড উড়িয়ে দিব। দরজা খোলা হয়। হযরত উমর (রা.) নগ্ন তরবারি হাতে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। তাকে দেখে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সামনে এগিয়ে আসেন এবং হযরত উমরের পোশাকের প্রান্ত ধরে সজোরে ঝাকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করেন কী উদ্দেশ্যে এসেছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি দেখছি, তুমি খোদার শাস্তি পাওয়ার জন্য সৃষ্টি হও নি। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি মুসলমান হতে এসেছি। মহানবী (সা.) এই কথা শুনে আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহু আকবার বলে উঠেন এবং সাহাবীরাও

সাথে সাথে এত উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন যে, মক্কার পাহাড়-পর্বত গুঞ্জরিত হয়ে উঠে।

হযরত খাব্বাব (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা একবার মহানবী (সা.) এর কাছে আমাদের কষ্টের কথা বললাম। তিনি (সা.) তখন পবিত্র কা'বার ছায়ায় তাঁর চাদর বিছিয়ে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্যের প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছেন তাদের একজনের জন্য মাটিতে গর্ত খোঁড়া হতো, এরপর তাকে তাতে পুঁতে ফেলা হতো আর এরপর করাত এনে তার মাথায় রেখে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো, তাদের এহেন কাজও তাকে তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। আবার লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে তার মাংস হাঁড় বা পেশী থেকে পৃথক করা দেয়া হতো, আর তাদের এহেন কাজ তাকে তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বা আমি যে উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছি আল্লাহ্ অবশ্যই সেই মিশন বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবেন। স্বাচ্ছন্দ্যের যুগও আসবে। এরপর তিনি (সা.) আরো বলেন, একজন আরোহী সানা থেকে হাযার মওত পর্যন্ত সফর করবে, সানা ও হাযার মওত ইয়ামেনের দু'টি নগরীর নাম আর বলা হয় এ উভয়ের মধ্যকার দূরত্ব ২১৬ মাইল। মোটকথা, মহানবী (সা.) বলেন, সে সফর করবে আর আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো ভয় তার থাকবে না। অথবা এ-ও বলেছেন যে, কেবল তার মেষপালের ওপর নেকড়ের আক্রমণের ভয় থাকবে; কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ। এসব কিছুই ধৈর্য্যের মাধ্যমে হবে। এটি বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত।

অপর এক স্থলে এই রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হলাম। তিনি (সা.) একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং তাঁর হাত মাথার নিচে রাখা ছিল। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি আমাদের জন্য ঐ জাতির বিরুদ্ধে দোয়া করবেন না যাদের পক্ষ থেকে আমাদের আশঙ্কা হয় যে, পাছে তারা আবার আমাদেরকে আমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত না করে। তখন তিনি (সা.) আমার থেকে তিনবার নিজের মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর যখনই আমি তাঁর কাছে এই প্রশ্ন করি তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। তৃতীয়বার তিনি উঠে বসেন এবং বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তোমাদের পূর্বে খোদা তা'লার এমন মু'মিন বান্দারা গত হয়েছে, যাদের মাথার ওপর করাত রেখে তাদেরকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো, তবুও তারা নিজেদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয় নি। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য পথ বের করবেন এবং তিনি তোমাদের কার্যনির্বাহক।

হযরত খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি (রা.) বলেন, আমি পেশায় একজন কর্মকার ছিলাম এবং আস বিন ওয়ায়েলের কাছে আমার পাওনা ছিল। আমি তার কাছ থেকে উক্ত পাওনা চাইতে গেলাম। তখন সে আমাকে বলল, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা কিছুতেই পরিশোধ করব না। অর্থাৎ যতক্ষণ তুমি এ মর্মে ঘোষণা না দিবে যে, আমি মহানবী (সা.)-এর বয়আতের বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসেছি বা যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, আমি তাকে বললাম, তুমি মরে আবার জীবিত হলেও আমি

কিছুতেই মুহাম্মদ (সা.)-কে অস্বীকার করব না, অর্থাৎ তাঁকে অস্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। সে একইভাবে উত্তর দেয় আর বলে, আমি মরে পুনরায় যখন জীবিত হব আর নিজ সম্পদ ও সন্তানসন্ততির কাছে ফিরে আসব তখন তোমার ঋণ পরিশোধ করব; অর্থাৎ সেও বলে দেয় যে, আমি তোমার পাওনা ফেরত দিব না। হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, উক্ত বিষয়ে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا

অর্থাৎ, তুমি কি সেই ব্যক্তির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা কর নি, যে আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে, আমাকে অবশ্যই অনেক ধনসম্পদ এবং অনেক সন্তান-সন্ততি দান করা হবে। সে কি অদৃশ্য বিষয়াদি উদঘাটন করেছে, নাকি রহমান খোদার কাছ থেকে সে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে? এমনটি কখনো হবে না! আমরা তার সেই কথা সংরক্ষণ করে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করে দিব। আর সে যা কিছু নিয়ে দম্ভ করছে, আমরা তার উত্তরাধিকারী হয়ে যাবো আর সে আমাদের কাছে একাই আসবে। **(সূরা মরিয়ম, আয়াত: ৭৮-৮১)**

হযরত খাব্বাব (রা.) পেশায় কর্মকার ছিলেন এবং তরবারি বানাতেন। মহানবী (সা.) তাকে অনেক ভালোবাসতেন এবং কখনো কখনো তার সাথে সাক্ষাৎ করতেও যেতেন। তার মনিব যখন জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) খাব্বাবের কাছে আসেন, তখন সে উত্তপ্ত লোহা খাব্বাব (রা.)-এর মাথায় রেখে তাঁকে শাস্তি দিতে থাকে। তিনি লোহার কাজ করতেন, লোহা চুল্লীতে গরম করে তার মাথার ওপর রাখা আরম্ভ করে। হযরত খাব্বাব (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! খাব্বাবকে সাহায্য কর। অর্থাৎ মহানবী (সা.) দোয়া করেন। অতএব, একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, এর ফলে যা হয় তা হলো, তার মনিব উম্মে আনমারের মাথায় এমন কোন রোগ হয় যার ফলে সে কুকুরের মতো আওয়াজ করত। তাকে বলা হয়, তুমি দাগ লাগিয়ে নাও, অর্থাৎ তোমার মাথায় গরম লোহার সেঁক লাগিয়ে নাও। অতএব হযরত খাব্বাব (রা.) তার মাথায় গরম লোহার সেঁক দিতেন। সে হযরত খাব্বাব (রা.)-কে দিয়ে নিজের মাথায় সেঁক নিতে বাধ্য হয়।

আবু লায়লা কিন্দি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত খাব্বাব (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর নিকট এলে হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, কাছে এস, কেননা হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) ব্যতীত এ বৈঠকে বসার ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে অধিক যোগ্য আর কেউ নেই। হযরত খাব্বাব (রা.) তার পিঠের সেসব দাগ দেখাতে আরম্ভ করেন যা মুশরেকদের নির্যাতনের ফলে তার পিঠে পড়েছিল। এটি তাবাকাতুল কুবরার রেওয়ায়েত।

পিঠের ক্ষত দেখানো সম্পর্কে অপর এক স্থানে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ এভাবে রয়েছে- শা'বির পক্ষ থেকে বর্ণিত যে, হযরত খাব্বাব (রা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর কাছে এলে তিনি হযরত খাব্বাব (রা.)-কে তাঁর বৈঠকখানায় বসান এবং বলেন, পৃথিবীর বুকে কোন ব্যক্তি এই বৈঠকে এর চেয়ে বেশি অধিকার রাখে না কেবল এক ব্যক্তি ব্যতীত। তখন হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই ব্যক্তি কে? উত্তরে হযরত উমর (রা.) বলেন, তিনি হলেন, বেলাল (রা.)। একথা শুনে হযরত খাব্বাব (রা.) হযরত উমর (রা.) কে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি আমার চেয়ে বেশি যোগ্য নন। কেননা

বেলাল (রা.) যখন মুশরেকদের হাতে ছিলেন তখন কেউ না কেউ তার সাহায্যকারী ছিল যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাকে রক্ষা করতেন। কিন্তু আমাকে রক্ষা করার কেউ ছিল না। হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, একদিন আমার অবস্থা এমন হয় যে, লোকজন আমাকে ধরে আমার জন্য আগুন জ্বালিয়ে আমাকে তাতে নিক্ষেপ করে। জ্বলন্ত কয়লায় আমাকে ফেলে এক ব্যক্তি আমার বুকে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন আমার কোমরই আমাকে উত্তপ্ত কয়লা থেকে রক্ষা করেছিল অথবা বলেছেন, আমার পিঠই তপ্ত মাটিকে ঠান্ডা করেছে। এরপর তিনি তার পিঠ থেকে নিজের কাপড় সরিয়ে দেখান, তা শ্বেতির মতো শুভ্র ছিল। অর্থাৎ উত্তপ্ত কয়লার ওপর শোয়ানোর পর সেই উত্তপ্ত কয়লা ঠান্ডা করার মতো কোন কিছু ছিল না, কেবল শরীরের চামড়া ও চর্বিই ছিল যা গলে সেই কয়লাকে ঠান্ডা করছিল।

অনুরূপভাবে এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েতও রয়েছে, শা'বি বলেন, হযরত খাব্বাব (রা.) মুশরেকদের হাতে যেসব নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হতেন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার পিঠ দেখুন! হযরত উমর (রা.) পিঠ দেখে বলেন, এমন পিঠ আমি আর কারো দেখি নি। তখন হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, আগুন জ্বালানো হতো এবং তাতে আমাকে হেঁচড়ানো হতো। সেই আগুনকে আমার পিঠের চর্বি ছাড়া অন্য কিছু নির্বাপিত করত না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত খাব্বাব (রা.) সম্পর্কে যা বর্ণনা করেন তা নিম্নরূপ, তিনি (রা.) বলেন,

স্মরণ রাখা উচিত যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনে কৃতদাসরাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করেছিলেন। যেমন খাব্বাব বিনুল আরত একজন কৃতদাস ছিলেন। তিনি কর্মকার ছিলেন। তিনি একেবারে প্রাথমিক দিনগুলোতে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। মানুষ তাকে ভীষণ কষ্ট দিত। এমনকি তারই চুল্লীর কয়লা বের করে সেগুলোর উপর তাকে শুইয়ে দেয়া হতো এবং তিনি যাতে কোমর নাড়াতে না পারেন সেজন্য বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হতো। তার পারিশ্রমিক যাদের প্রদেয় ছিল তারা সেই অর্থ দিতে অস্বীকার করে, কিন্তু এই অর্থনৈতিক এবং দৈহিক নিপীড়ন সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যও তিনি দোদুল্যমান হন নি, বরং ঈমানের ওপর অবিচল ছিলেন। তার পিঠের সেসব দাগ তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। যেমন, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি একবার তার অতীতের কষ্টের কথা উল্লেখ করলে হযরত উমর (রা.) তাকে পিঠ দেখাতে বলেন। তিনি যখন পিঠের কাপড় সরান তখন তার পিঠজুড়ে শ্বেতী রোগের দাগের ন্যায় শুভ্র দাগ দেখা গেল।

অতঃপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরেক স্থানে বলেন, একবার হযরত খাব্বাবের পিঠ থেকে কাপড় সরে গেলে প্রাথমিক যুগের এক নওমুসলিম কৃতদাসের সাথিরা দেখল যে, তার পিঠের চামড়া মানুষের মতো নয় বরং পশুর ন্যায়। তারা ভয় পেয়ে যায় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে, এটি আপনার কী রোগ হলো? হযরত খাব্বাব (রা.) হেসে বলেন, এটি কোন রোগ নয়। এটি সেই সময়ের স্মৃতিচিহ্ন যখন আরবের লোকেরা আমাদের অর্থাৎ নওমুসলিম কৃতদাসদের মক্কার অলিতে গলিতে শক্ত ও অমসৃণ পাথরের উপর হেঁচড়াতো এবং লাগাতার এই অত্যাচার আমাদের উপর অব্যাহত থাকে যার ফলে আমার পিঠের চামড়া এরূপ হয়ে গেছে। প্রাথমিক যুগের এসব মুসলমান, যারা গরীবও ছিলেন আবার যাদের অধিকাংশ কৃতদাস ছিলেন, ইসলাম গ্রহণের পর তাদেরকে এসব অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য

করতে হয়েছে যার বিবরণ আমরা এখনই হযরত খাব্বাব (রা.)-এর বরাতে শুনলাম। তাদেরকে কখনো আগুনের উপর শুইয়ে দেয়া হতো আবার কখনো পাথরের ওপর টানা-হেঁচড়া করা হতো। এটি সত্য যে, তারা এসব কষ্ট নির্যাতন সহ্য করেছেন। পরবর্তীতে যখন ইসলাম উন্নতি লাভ করে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কীরূপ প্রতিদানে ভূষিত করেছিলেন এবং কেমন জাগতিক মর্যাদায় তাদেরকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন– তার বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) তার খিলাফতকালে একবার মক্কায় আসেন। তখন শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর প্রভাবশালী নেতারা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাদের ধারণা ছিল- হযরত উমর আমাদের পরিবার বা বংশ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন; এখন তিনি স্বয়ং যেহেতু বাদশাহ্, তাই বোধহয় আমাদের বংশের পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করবেন আর আমরা আমাদের হারানো সম্মান ফিরে পাব। তাই তারা আসে এবং তার (রা.) সাথে আলাপ জুড়ে দেয়। তারা কেবল কথা শুরু করেছিল, এমন সময় হযরত উমরের সভায় হযরত বেলাল (রা.) এসে উপস্থিত হন; স্বল্পক্ষণ পর হযরত খাব্বাব (রা.) উপস্থিত হন। এভাবে একে একে প্রাথমিকযুগে ঈমান আনয়নকারী কৃতদাসেরা আসতে থাকেন। (অর্থাৎ ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যেসব কৃতদাস ঈমান এনেছিলেন- তারা সবাই একের পর এক আসতে থাকেন)। এরা সেসব মানুষ ছিলেন- যারা ঐসব নেতাদের বা তাদের বাপ-দাদাদের কৃতদাস ছিলেন। (অর্থাৎ যারা আসছিলেন, তারা সবাই এই তরুণ নেতাদের- যারা সেখানে বসে ছিল আর যারা সমসাময়িক নেতৃবৃন্দ ছিল- তাদের পিতাপিতামহের কৃতদাস ছিল)। তারা যখন কৃতদাস ছিলেন, তখন তারা নিজেদের ক্ষমতার যুগে তাদের ওপর চরম নির্যাতন করত। হযরত উমর প্রত্যেক দাসের আগমনে তাকে স্বাগত জানান। (হযরত বিলাল, হযরত খাব্বাব প্রমুখ আসছিলেন; আর প্রথম যুগে ঈমান আনয়নকারী অনেক ব্যক্তি- যারা কোন এক যুগে কৃতদাস ছিলেন, তারা আসছিলেন; আর যখনই তারা সভায় প্রবেশ করতেন, হযরত উমর খুব গুরুত্বের সাথে ও ভক্তি সহকারে তাদের স্বাগত জানাতেন।) তিনি লিখেন, হযরত উমর প্রত্যেক দাসের আগমনে তাকে স্বাগত জানান এবং নেতাদেরকে বলেন, আপনারা একটু পিছিয়ে যান। (নেতারা সভায় সামনের দিকে বসে ছিল; যখন এই প্রথমদিকের ঈমান আনয়নকারীরা আসেন, তখন তিনি (রা.) মক্কার নেতাদেরকে বলেন- একটু পিছিয়ে যাও, তাদেরকে সামনে বসতে দাও।) এক পর্যায়ে সেই তরুণ নেতারা, যারা হযরত উমর (রা.)-এর সাথে দেখা করতে এসেছিল, পেছাতে পেছাতে দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছে। বর্তমান যুগের মতো সে যুগে বড় বড় হলঘর ছিল না, হয়ত ছোট একটি কক্ষ হবে। আর যেহেতু তাদের সবার সেখানে স্থান সংকুলান সম্ভব ছিল না এজন্য সেই নেতাদের পিছু হটতে হটতে জুতার উপর গিয়ে বসতে হয়। যখন মক্কার সেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা জুতার কাছে গিয়ে পৌঁছল এবং তারা স্বচক্ষে দেখল যে, একের পর এক কৃতদাস আসল এবং তাদেরকে সামনে বসানোর জন্য নেতাদেরকে পিছু হটার আদেশ দেয়া হলো; এতে তারা গভীর মর্মযাতনা পেলো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, খোদা

তা'লাও তখন এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যে, একের পর এক কয়েকজন এমন মুসলমান আসেন যারা কোন এক যুগে কাফেরদের কৃতদাস ছিলেন। যদি সেই নেতারা শুধু একবার পিছু হটতো তবে তারা উপলব্ধিই করতে পারতো না। কিন্তু যেহেতু তাদেরকে বার বার পিছু হটতে হয়েছে এজন্য তারা এটি সহ্য করতে পারে নি এবং উঠে বাইরে বেরিয়ে যায়। বাইরে বেরিয়ে তারা একে অন্যের কাছে অভিযোগ-অনুযোগ করতে থাকে যে, দেখ! আজ আমরা কতটা লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়েছি। একেকজন দাসের আগমনে আমাদেরকে পিছু হটানো হয়েছে। এমনকি শেষপর্যন্ত আমরা জুতার কাছে পৌঁছে গেছি। তখন তাদের মধ্য থেকে একজন যুবক বলল, এতে দোষ কার? উমরের নাকি আমাদের পিতৃপুরুষদের? তোমরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে এতে হযরত উমর (রা.)-এর কোন দোষ নেই। আমাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ ছিল যার শাস্তি আজ আমরা ভোগ করছি। কেননা, খোদা তা'লা যখন তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেন তখন আমাদের পিতৃপুরুষরা তাঁর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু এই কৃতদাসেরা তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বেচ্ছায় সর্ব প্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করেছিলেন। তাই আজ আমরা যদি বৈঠকে লাঞ্ছিত হয়েও থাকি তাতে হযরত উমর (রা.)-এর কোন দোষ নেই, দোষ আমাদেরই। তার কথা শুনে অন্যরা বলতে থাকে, আমরা এটা মেনে নিচ্ছি যে, এটি আমাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধের পরিণাম। কিন্তু এ অপমানের কলঙ্ক মোচনের কোন পথ খোলা আছে, নাকি নেই? এ বিষয়ে সবাই পরামর্শের পর বললো যে, আমরা তো এর কোন সমাধান পাচ্ছি না, চলো হযরত উমর (রা.)-কেই জিজ্ঞেস করি যে, এর প্রতিকার কী? অতএব তারা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট এসে বলল, আমাদের সাথে আজকে যা ঘটেছে তা আপনিও ভালো করে জানেন এবং আমরাও ভালোভাবে জানি। হযরত উমর (রা.) বলেন, ক্ষমা করো; আমি অপারগ ছিলাম, কেননা, এরা সেসব লোক যারা মহানবী (সা.)-এর বৈঠকেও সম্মানিত ছিলেন, হতে পারে একসময় এরা তোমাদের কৃতদাস ছিল; কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সভায় এরা সম্মানিত ছিলেন। তাই, তাদেরকে সম্মান করা আমার জন্য আবশ্যক ছিল। তারা বলল, আমরা জানি; এটা আমাদেরই অপরাধের ফল। কিন্তু এ লাঞ্ছনার দাগ দূর করারও কি কোন উপায় আছে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এ যুগে আমাদের জন্য এটা অনুমান করাও কঠিন যে, এসব লোক যারা মক্কার নেতা ছিল, মক্কায় তাদের কী পরিমাণ দাপট বা প্রভাব ছিল। কিন্তু হযরত উমর তাদের পারিবারিক বা বংশীয় অবস্থা খুব ভালো করে জানতেন। অর্থাৎ হযরত উমর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর মক্কাতেই বড় হয়েছিলেন তাই তিনি জানতেন এসব যুবকের পিতা-পিতামহরা কত সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তিনি জানতেন যে, তাদের সামনে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস কারো ছিল না। তিনি জানতেন যে, তারা কত প্রতাপ ও দাপটের অধিকারী ছিলেন। তারা যখন এ কথা বললো, তখন হযরত উমরের সামনে একে একে সমস্ত ঘটনা ভেসে উঠে আর তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তখন তিনি আবেগের আতিশয্যে কথাও বলতে পারেন নি; তিনি শুধুমাত্র হাত উঠিয়ে উত্তরের দিকে আঙ্গুলের ইশারা করেন, যার অর্থ ছিল উত্তরে অর্থাৎ

সিরিয়াতে কিছু ইসলামী যুদ্ধ চলছে, তোমরা যদি এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর তাহলে হয়ত এর প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। তারা উঠে এবং কালক্ষেপণ না করে এই নবাবযাদারা সেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রওয়ানা হয়ে যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, ইতিহাস বলে যে, তাদের মধ্যে একজনও জীবিত ফিরে আসে নি, সবাই সেখানেই শহীদ হয়ে যায় এবং এভাবে তারা নিজেদের বংশের ওপর থেকে লাঞ্ছনার কালিমা মোচন করে। মোটকথা, ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যারা শুরুতে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার সম্মান তারা লাভ করেছেন আর পরবর্তীতে যারা এসেছে তারা যদি এই কলঙ্কের দাগ মোচন করতে চায় তাহলে ত্যাগের মাধ্যমেই সম্ভব। হযরত খাব্বাব (রা.) এবং হযরত মিকদাদ বিন আমর (রা.) যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন এই দু'জনই হযরত কুলসুম বিন হিদামের ঘরে অবস্থান করেন আর হযরত কুলসুমের মৃত্যু পর্যন্ত তারা তার ঘরেই অবস্থান করেছিলেন। বদরের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর রওয়ানা হবার কিছু দিন পূর্বে হযরত কুলসুমের মৃত্যু হয়েছিল। অতঃপর তিনি হযরত সা'দ বিন উবাদার কাছে চলে যান। এরপর পঞ্চম হিজরীতে বনু কুরায়যা বিজিত হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত খাব্বাব এবং হযরত খিরাশ বিন সিম্মার মুক্ত কৃতদাস হযরত তামীম এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন রচনা করেন। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি (সা.) হযরত জাবর বিন আতীক (রা.)-এর সাথে হযরত খাব্বাবের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার-এর মতে প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতটি অধিক নির্ভরযোগ্য। হযরত খাব্বাব (রা.) বদর, উহুদ এবং পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

আবু খালেদ বর্ণনা করেন যে, একদিন আমরা মসজিদে বসেছিলাম, এমন সময় হযরত খাব্বাব (রা.) এসে নীরবে সেখানে বসে পড়েন। লোকজন তাকে বলে, আপনার বন্ধুরা আপনার সকাশে সমবেত হয়েছে যেন আপনি কিছু বলেন বা তাদেরকে কোন নির্দেশ প্রদান করেন। এতে হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, আমি তাদেরকে কোন্ বিষয়ে নির্দেশ দিব, এমন যেন না হয় যে, আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করব যা আমি নিজেই পালন করি না। এটি ছিল তাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং তাকওয়ার মান।

আব্দুল্লাহ্ বিন খাব্বাব তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) একবার অনেক দীর্ঘ নামায পড়িয়েছেন। লোকেরা বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি এমন দীর্ঘ নামায পড়িয়েছেন যা এর পূর্বে কখনোই পড়ান নি। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ এটি খোদার প্রতি আকর্ষণ ও ভয়-ভীতির নামায। আমি এতে আল্লাহ্ তা'লার কাছে তিনটি জিনিস ভিক্ষা চেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দু'টি জিনিস প্রদান করেছেন আর একটি স্থগিত রেখেছেন। আমি আল্লাহ্র কাছে চেয়েছি, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভীক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন যা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দান করেন। আমি আল্লাহ্র কাছে যাচনা করেছি যে, আমার উম্মতের ওপর যেন তাদের বিজাতীয় কোন শত্রু চাপিয়ে দেয়া না হয় যা আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। উম্মত হিসেবে আজও এই উম্মত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যদি কখনো কেউ চেপে বসে তাহলে এর জন্য মুসলমান রাষ্ট্রগুলোই দায়ী। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় উম্মত হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মত প্রতিষ্ঠিত আছে। তারপর বলেন, আমি আল্লাহ্র কাছে

দোয়া করেছি যে, আমার উম্মত যেন পরস্পর বিবাদে লিপ্ত না হয়। এটি আল্লাহ তা'লা আমাকে দেন নি। আর এর ফলে, বর্তমানে দলাদলি ও কুফরের ফতোয়াবাজির মতো কর্মকাণ্ড চলছে।

তারেক থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের একটি দল হযরত খাব্বাব (রা.) এর শুশ্রূষায় যান। তারা বলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ্! তুমি আনন্দিত হও, তুমি তোমার ভাইদের কাছে হওযে কাওসারে মিলিত হতে যাচ্ছ। হযরত খাব্বাব (রা.) বলেন, তোমরা আমার কাছে সেই সকল ভাইদের উল্লেখ করছ যারা অতীত হয়ে গেছেন আর তারা তাদের প্রতিদানের কিছুই ভোগ করতে পারেন নি। আর আমরা তাদের মৃত্যুর পর জীবিত আছি। এমনকি জাগতিক সেসব জিনিস আমাদের হস্তগত হয়েছে যা সম্পর্কে আশঙ্কা হয় যে, এসব হয়ত আমাদের অতীত পুণ্যের প্রতিদান, অর্থাৎ হয়ত প্রাপ্য প্রতিদান এই পৃথিবীতেই পেয়ে গেছি। হযরত খাব্বাব (রা.) দীর্ঘদিন যাবৎ গুরুতর অসুস্থ ছিলেন।

হারেসা বিন মুযাররিব থেকে বর্ণিত, আমি হযরত খাব্বাব (রা.)-এর নিকট তার শুশ্রূষায় উপস্থিত হলাম। তার শরীরের সাত স্থানে চিকিৎসার উদ্দ্যেশ্যে দাগ দেয়া হয়েছিল। আমি তাকে বলতে শুনেছি, আমি যদি মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, মৃত্যু কামনা করা কারো জন্য বৈধ নয়, তাহলে আমি নিজের মৃত্যু কামনা করতাম। অর্থাৎ তিনি এতটাই কষ্টের মধ্যে ছিলেন। তার কাফনের কাপড় আনা হয় যা কাবাতী কাপড়ের তৈরী ছিল বা মিসরের তৈরী পাতলা কাপড়ের ছিল। সেটা দেখে তিনি কাঁদতে থাকেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর চাচা হযরত হামযা (রা.)-এর মৃতদেহ একটি চাদরে দাফন করা হয়, তা দিয়ে তার মাথা ঢাকতে গেলে পা বেরিয়ে পড়ত আর পা ঢাকতে গেলে মাথা বেরিয়ে পড়ত। শেষ পর্যন্ত তার পায়ের ওপর ইযখার ঘাস দেয়া হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সময় আমার এমন অবস্থা ছিল যে, আমি এক দিনার বা এক দিরহামেরও মালিক ছিলাম না অর্থাৎ আমার কাছে এক কানাকড়িও ছিল না। আর এখন আমার অবস্থা দেখ। তিনি বলেন, এখন আমার বাড়ির এক কোণে যে সিন্দুক রাখা আছে সেখানে পুরো চল্লিশ হাজার দিরহাম রয়েছে। আমার ভয় হয়, আমাদের প্রতিদান এই পৃথিবীতেই দিয়ে দেয়া হয় নি তো।

হযরত খাব্বাব বর্ণনা করেন যে, আমরা মহানবী (সা.) এর সাথে হিজরত করেছি। আমরা আল্লাহ্ তা'লারই সন্তুষ্টি যাচনা করতাম আর আমাদের পুরস্কৃত করার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজ হাতে নিয়ে নেন। আমাদের মাঝে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন আর তাদের প্রতিদানের কিছুই তারা এই পৃথিবীতে ভোগ করেন নি। তাদের মাঝে হযরত মুসআব বিন উমায়েরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর আমাদের মাঝে এমন ব্যক্তিও আছেন যাদের ফল পরিপক্ক হয়ে গেছে আর তারা তা কুঁড়াচ্ছেন। হযরত মুসআব উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন আর তার জন্য আমরা কেবলমাত্র একটি কাফনের কাপড় যোগাড় করতে পেরেছিলাম। আমরা যখন এর দ্বারা তার মাথা ঢাকতে যেতাম তার পা বেরিয়ে পড়ত আর যখন পা ঢাকতে যেতাম তখন মাথা বেরিয়ে পড়ত। এটি দেখে মহানবী (সা.) বলেন, আমরা যেন তার মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেই আর পায়ের ওপর যেন ইযখার ঘাস দিয়ে দেই।

হযরত যায়েদ বিন ওয়াহাব বর্ণনা করেন, আমরা সিফ্ফীনের যুদ্ধ শেষে হযরত আলীর সাথে ফিরছিলাম। তিনি যখন কুফার দারপ্রান্তে পৌঁছেন তখন আমাদের ডান পাশে সাতটি কবর দেখতে পান। হযরত আলী জিজ্ঞেস করেন, এ কবরগুলো কার? লোকজন বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি সীফ্ফীনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর খাব্বাব (রা.)

ইন্তেকাল করেছেন। তিনি ওসীয়্যত করেছেন, তাকে যেন কুফার বাইরে দাফন করা হয়। সেখানকার মানুষের রীতি ছিল, তারা নিজেদের (নিকটাত্মীয়) মৃত ব্যক্তিদেরকে নিজেদের উঠানে বা ঘরের দরজার সাথে দাফন করত। কিন্তু যখন তারা হযরত খাব্বাব (রা.)-কে দেখলেন যে, তিনি বাইরে দাফন করার ব্যপারে ওসীয়্যত করে গেছেন তখন অন্যরাও বাইরে দাফন করতে লাগল। হযরত আলী বলেন, আল্লাহ্ খাব্বাব এর প্রতি কৃপা করুন। তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আনুগত্য করে হিজরত করেছেন এবং একজন মুজাহিদ হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আর দৈহিকভাবেও তাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম করে আল্লাহ্ তার প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। অর্থাৎ, তার শারীরিক রোগ-ব্যাধি দীর্ঘদিন ছিল। হযরত আলী (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি পুণ্যকর্ম করে আল্লাহ্ তার প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। হযরত আলী কবরগুলোর নিকটে যান এবং বলেন, হে কবরের অধিবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা মু'মিন ও মুসলমান। তোমরা অগ্রে গিয়ে আমাদের জন্য উপকরণ সৃষ্টিকারী আর আমরা তোমাদের পশ্চাতে এসে তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ও তাদেরকে ক্ষমা কর এবং নিজ কৃপায় আমাদের ও তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা কর। সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে পরকালকে স্মরণ করে এবং হিসাবকে সামনে রেখে পুণ্যকর্ম করে আর তার নিজের ন্যূনতাম চাহিদা পূরণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাতেই সন্তুষ্ট থাকে আর মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট রাখে।

হযরত আলী (রা.) সেখানে এই দোয়া করেন। হযরত খাব্বাব (রা.)-এর মৃত্যু ৩৭ হিজরী সনে ৭৩ বছর বয়সে হয়েছিল।